পৌরাণিক সাহিত্য বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারতের প্রচারের প্রয়োজন ছিল। তাই অনুবাদকগণ রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের মারফতে পৌরাণিক সাহিত্যের মূল নির্যাস প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন।

রামায়ণের অনুবাদ

● কৃত্তিবাস ওঝা ঃ

'কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলংকার'—কৃত্তিবাস সম্পর্কে মাইকেল মধুসূদনের এই স্তুতি যথার্থ। তিনি সত্যই এ বঙ্গের অলংকার। তিনি অনুবাদ সাহিত্যের আদি কবি। সেজন্য তিনি বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের পথিকৃৎ। তাঁর অনুবাদ আমাদের বাঙালি জীবনের ঘরোয়া মর্মস্পর্শী মর্মানুবাদ। তাই তাঁর 'শ্রীরাম পাঁচালী' আজও বাঙালির ঘরে ঘরে সমাদৃত হয়। কবি নিজে রামায়ণ রচনার কারণ হিসেবে বলেছেন, 'লোক বুঝাইতে কৈলা কৃত্তিবাস পণ্ডিত'।

☆ কৃত্তিবাসের আত্মজীবনী ও আবির্ভাব কাল ঃ

যে কবিরা ভণিতায় পর্যন্ত আপনার নাম সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করতেন না, সেকালে কৃত্তিবাস আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কিছুই বাদ দিয়ে যাননি। বুঝতে পারি ব্যক্তিত্ববান কবিপ্রকৃতি নিজ সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন, শুধু পিতৃঋণ ও কুলগরিমা কীর্তন করেই ক্ষান্ত হতে পারছেন না। কৃত্তিবাসের এই আত্মপরিচয় নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। তা থেকে তাঁর পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতির পরিচয় জানা যায়।

কবির পূর্বপুরুষের বাস ছিল পূর্ববঙ্গে, কিন্তু সে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তিনি পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাতীরের নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে বসবাস করেন। কৃত্তিবাসের পিতা বনমালী। কৃত্তিবাসের ছয় ভাই, এক বোন। এঁরা মুখোপাধ্যায় উপাধি হলেও ওঝা উপাধিতেই বেশি পরিচিত ছিলেন।

দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থে উদ্ধৃত কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর মধ্যে আছে—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য (পূর্ণ) মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।।

এই শ্লোক অনুযায়ী মাঘ মাসের রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথি ছিল ১৩৫২, ১৩৭২, ১৩৭৫ এবং ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জ্যোতিষ গণনার দ্বারা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ১৪৩২ খ্রিঃ, ১২ই ফেব্রুয়ারি রবিবার রাত্রিতে কৃত্তিবাসের জন্ম। গোপাল হালদার মনে করেন, ১৩৯৮ নয় ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দে জন্ম এবং এই সময়ে গৌড়েশ্বর ছিলেন সম্ভবত গণেশ বা দনুজমর্দনদেব।

বর্তমানে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কৃত্তিবাসের জন্মকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', 'ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী' প্রভৃতি থেকে তথ্য প্রমাণ হাজির করে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ১৪৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি রবিবার। ঐতিহাসিক কানু পিল্লাইও এই মত পোষণ করেন। এই সময়ের রাজা ছিলেন রুকনুদ্দিন বরবক্‌শা, যার সময়ে সভাকবি ছিলেন কৃত্তিবাস।

আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়, কৃত্তিবাস শৈশব থেকে পড়াশোনায় দক্ষ ছিলেন। এগারো-বারো বছর বয়সে কবি গঙ্গানদী পার হয়ে উত্তরবঙ্গে গুরুগৃহে যাত্রা করেন। শিক্ষা শেষ করে কবি রাজপণ্ডিত হওয়ার অভিপ্রায়ে গৌড়ের রাজসভায় উপস্থিত হন ঃ

Scanned with CamScanner

রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চশ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে।।

দেবী সরস্বতীর কৃপায় রসসমৃদ্ধ মধুর শ্লোক আবৃত্তি করে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরকে মুগ্ধ করেন। রাজা কবিকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে রাজসভায় তাকে কবির আসনে বরণ করে নেন। পরে তিনি এই গৌড়েশ্বরের নির্দেশেই 'শ্রীরাম পাঁচালী' রচনা করেন। আদি, অযোধ্যা, আরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা, লঙ্কা, উত্তরা—এই সাত কাণ্ডে বিভক্ত করে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন।

▲ শ্রীরাম পাঁচালী ঃ কাহিনিবিন্যাস/বিষয়বস্তু ঃ

☆ **আদিকাণ্ড ঃ** বিষ্ণুর চার অংশে প্রকাশ, রত্নাকর দস্যু ও রামনামের মাহাত্ম্য, মান্ধাতার উপাখ্যান, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও বংশনাশ, গঙ্গামাহাত্ম্য, সৌদাস রাজার উপাখ্যান, দশরথের বিবাহ, দশরথের প্রতি অন্ধকের অভিশাপ, দশরথের কৈকেয়ীকে বর দেবার অঙ্গীকার, দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও ভগবানের চার অংশে জন্মগ্রহণ, শ্রীরামের জন্ম বিবরণ, সীতার জন্ম বিবরণ, অহল্যা উদ্ধার, রামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গ ও বিবাহ, পরশুরামের দর্পচূর্ণ প্রভৃতি।

☆ **অযোধ্যাকাণ্ড ঃ** শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক প্রসঙ্গ, কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা, পিতৃসত্য পালনের জন্য শ্রীরামের বনে গমনের সিদ্ধান্ত, ভরতের অযোধ্যায় আগমন, দশরথের মৃত্যু, শ্রীরাম কর্তৃক দশরথের শ্রাদ্ধ। সিংহাসনে শ্রীরামের পাদুকা রেখে ভরতের রাজ্যশাসন, দশরথের উদ্দেশ্যে সীতার পিণ্ডদান, গয়া মাহাত্ম্য ইত্যাদি।

☆ **আরণ্যকাণ্ড ঃ** শ্রীরামচন্দ্রের চিত্রকূটে অবস্থান ও মুনিদের স্থানান্তরে যাওয়ার কল্পনা, শ্রীরামের অত্রি মুনির আশ্রমে গমন, শ্রীরামচন্দ্রের বনান্তরে ভ্রমণ, সূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন, রাবণের সীতাহরণ, জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ, শ্রীরামের বিলাপ ও সীতা অন্বেষণ, শবরীর উপাখ্যান ইত্যাদি।

☆ **কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ঃ** সুগ্রীবের আশঙ্কা ও রামের সঙ্গে মিলন, সীতা উদ্ধারে সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা, শ্রীরাম কর্তৃক বালি বধ, সুগ্রীবের অভিষেক, সীতা অন্বেষণে সৈন্য প্রেরণ, সম্পাতির কাছে সীতার সন্ধানলাভ ও সাগর উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্যোগ ইত্যাদি।

☆ **সুন্দরাকাণ্ড ঃ** সাগর উত্তীর্ণ হওয়ার কথা, হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত, হনুমানের সীতা অন্বেষণ, হনুমানের অশোক বনে প্রবেশ, সীতা ও হনুমানের কথোপকথন, হনুমানের লঙ্কাদাহন, বিভীষণের লঙ্কাত্যাগ, নল কর্তৃক সাগরে সেতু বন্ধন, শ্রীরামের ভস্মলোচন বধ ও সসৈন্যে লঙ্কায় প্রবেশ ইত্যাদি।

☆ **লঙ্কাকাণ্ড ঃ** রাবণের আদেশে শুক-সারণের রামসৈন্য পরিদর্শন, রামের মায়ামুণ্ড প্রদর্শনে সীতার বিলাপ, সরমা কর্তৃক সীতার সান্ত্বনা, অঙ্গদের রায়বার, রাম-রাবণের প্রথম যুদ্ধ, কুম্ভকর্ণের অকালে নিদ্রাভঙ্গ, যুদ্ধে কুম্ভকর্ণের পতন, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ ও সসৈন্য শ্রীরাম লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা, ইন্দ্রজিত বধ। রাবণের সীতাবধের সঙ্কল্প ও মন্দোদরী কর্তৃক বাধাদান, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে শ্রীরামের বিলাপ, লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভ, শ্রীরামের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ, শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব, শ্রীরামের দেবীস্তুতি, রাবণ বধ, রাবণের কাছে শ্রীরামের রাজনীতি শিক্ষা, বিভীষণের শোক,

Scanned with CamScanner

মন্দোদরীর বিলাপ ও শ্রীরামের কাছে অবৈধব্য বর লাভ, রাবণের সৎকার ও মুক্তি, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, শ্রীরামের কৈকেয়ী সম্ভাষণ ইত্যাদি।

☆ **উত্তরাকাণ্ড :** শ্রীরামের সভায় মুনিদের আগমন, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম, তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি, রাবণাদির বিবাহ ও মেঘনাদের জন্ম, কার্তবীর্যার্জুনের কাছে রাবণের পরাজয়, যমলোকে রাবণের অভিযান, রাবণের কাছে যমের পরাজয়, সীতার বনবাস, শ্রীরামের সোনার সীতা নির্মাণ, শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ, লবকুশের যজ্ঞাশ্ব বন্ধন, লবকুশের সঙ্গে শ্রীরামের যুদ্ধ, লবকুশ কর্তৃক রামায়ণগান, সীতার পাতাল প্রবেশ, শ্রীরাম, ভরত ও শত্রুঘ্নের স্বর্গগমন।

● **মূল্যায়ন :**

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : "বিশ্ব-মানবের সাহিত্য-রস-পিপাসিত মনের জন্য রাম-কথা এক অক্ষয় রসভাণ্ডার রূপে বিরাজমান। ....রামায়ণের প্রথম প্রচারের সময় হইতেই ইহার অমৃত-প্রবাহ ভারতীয় পারিবারিক জীবনকে পবিত্র ও পুণ্যময় করিয়া রাখিয়াছে। সত্যনিষ্ঠা, পিতৃভক্তি, পাতিব্রত্য, পত্নীপ্রেম, সৌভ্রাত্র, প্রভুভক্তি, আশ্রিত-রক্ষা প্রভৃতি যে-সমস্ত গুণে সমাজে মানুষের মধ্যে শান্তি ও সুখ সহজলভ্য হয়, যে-সমস্ত গুণে মানুষ দেবতার পদে উন্নীত হইতে পারে, নিখিল চিত্ত-মন্থনকারী মনোহর উপাখ্যানের মাধ্যমে, উপাখ্যানের পটভূমিকা নগর ও অরণ্য উভয়ের পারিপার্শ্বিকে, অদ্ভুত সুন্দরভাবে সকলকে প্রীতি বিস্মিত করিবার সে সমস্ত গুণ ও আদর্শ রামায়ণে প্রতিফলিত হইয়া আছে।"

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : "তুর্কী অধিকারে গৃহের মধ্যেও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব ঘটিয়াছিল। অসহায় অত্যাচারিতকে উদ্বুদ্ধ করিতে জাতির সংহতির জন্য পুরুষসমাজে যে পৌরুষ, যে সততা, যে সৌহার্দ্য, যে ভ্রাতৃত্ব, তেজোবীর্য্য এবং ত্যাগের প্রয়োজন ছিল, বিধর্মীর বলাৎকার এবং প্রলোভনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে বাঙ্গালার রমণীগণের মধ্যে যে দার্ঢ্য, যে সাহস, সহিষ্ণুতা এবং সতীত্বের মর্যাদাবোধের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল, কৃত্তিবাস সেই প্রয়োজনের পরিপূরক গায়ক রূপেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।"

■ মধ্য যুগের অনুবাদ কাব্যের বৈশিষ্ট্য ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ :

মধ্য যুগের অনুবাদ কাব্যের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়—

এক, এগুলি হুবহু মূলের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, তা ভাবানুবাদ বা মর্মানুবাদ।

দুই, ভক্তিবাদের অবতারণা।

এই দুটি বৈশিষ্ট্যই কৃত্তিবাসের অনুবাদের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

☆ **কৃত্তিবাসের মৌলিকতা ও মূলানুগত্যের পরিচয় : বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য :**

মূল বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালীতে বর্ণিত কাহিনি ও চরিত্রের পার্থক্য যথেষ্ট। কৃত্তিবাস তাঁর এই মহান কাব্য রচনার পেছনে দুটি কারণের কথা বলেছেন—প্রথমত, পৃষ্ঠপোষক রাজার আদেশ। দ্বিতীয়ত, লোকশিক্ষার সামাজিক দায়িত্ববোধ। পিতা-মাতার আশীর্বাদ, গুরুর অনুমতি, 'বাল্মীকি রামায়ণ'-এর অনুপম

Scanned with CamScanner

বাল্মীকি রচিত মূল রামায়ণ কাহিনি অবলম্বনে কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণ রচনা করলেও তিনি তাঁর প্রতিটি শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পাঁচালির আদর্শে তাঁর রামায়ণ কাব্য রচনা করেছেন। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণ হয়ে উঠেছে এক নতুন স্বাদের। কৃত্তিবাস রচনা করেছেন বাঙালির মন নিয়ে বাঙালির মতো করে তার বাংলা রামায়ণ। শ্রীরাম পাঁচালী মহাকাব্য নয়,—বাল্মীকির মহাকাব্যের সেই সংযত গম্ভীর করুণ গ্রাম্য গানে বাংলা পয়ারের ছন্দে পরিণত হয়েছে বাঙালির ভাবাপ্লুত ভক্তিরস। তার চরিত্রাদর্শে ও চরিত্রচিত্রণেও তাই সেই মহাকাব্যের ভাস্কর্য বলিষ্ঠতা নেই, আছে বাঙালির পটুয়ার নিপুণ স্বচ্ছন্দ রেখার মাধুর্য।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ মূল বাল্মীকি রামায়ণের অনুসরণ নয়। 'বাল্মীকি রামায়ণে'র সঙ্গে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালিতে বর্ণিত কাহিনি ও চরিত্রের পার্থক্য যথেষ্ট। মূল কাহিনিকে তিনি পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে নতুন রূপে পরিবেশন করেছেন। শুধু বাল্মীকি রামায়ণ নয়, 'জৈমিনি ভারত', 'অদ্ভুত রামায়ণ', 'দেবী ভাগবত', 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ', 'পদ্মপুরাণ' প্রভৃতি বিখ্যাত মহাকাব্য, পুরাণ ও তত্ত্বগ্রন্থ সমূহ থেকে তিনি উপাদান গ্রহণ করেছেন। কৃত্তিবাস বাল্মীকির যে সমস্ত কাহিনি পরিত্যাগ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

ক. কার্তিকের জন্ম।
খ. বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ।
গ. বিশ্বামিত্র কথা।
ঘ. অম্বরীশ যজ্ঞ।
ঙ. রামচন্দ্র কর্তৃক আদিত্য হৃদয় স্তব পাঠ।

আবার কৃত্তিবাস নিম্নলিখিত কাহিনিগুলি বাল্মীকি রামায়ণ থেকে গ্রহণ করেন নি। সেজন্য ধরে নেওয়া যেতে পারে এই কাহিনিগুলি তাঁর মৌলিক কল্পনাপ্রসূত।

এক. সৌদাস-দিলীপ-রঘুর কাহিনি।
দুই. দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি।
তিন. গণেশের জন্ম।
চার. সম্বরাসুর বধ।
পাঁচ. কৈকেয়ীর বরলাভ।
ছয়. গুহকের সঙ্গে মিতালী।
সাত. হনুমান কর্তৃক সূর্যকে কক্ষতলে ধারণ।
আট. বীরবাহুর যুদ্ধ।
নয়. তরণীসেন-মহীরাবণ-অহিরাবণ কাহিনি।
দশ. রাবণ বধের জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক দেবী চণ্ডিকার অকাল বোধন এবং নীলপদ্মের কাহিনি।
এগারো. গণকের ছদ্মবেশে হনুমান কর্তৃক মন্দোদরীর কাছ থেকে রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ।
বারো. মুমূর্ষু রাবণের কাছে রামচন্দ্রের রাজনীতি শিক্ষা।
তেরো. দেবর-বধূদের অনুরোধে সীতা কর্তৃক খড়ির দ্বারা রাবণের মূর্তি অঙ্কন, তা দেখে রামের মনে সীতা সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টি, যার ফলে সীতা নির্বাসন।

Scanned with CamScanner

চৌদ্দ, লব-কুশের যুদ্ধ ইত্যাদি।
যে সব ঘটনা বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়া অন্য সূত্র থেকে নিয়েছেন—

☆ **আদিকাণ্ড :**
(ক) হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান—দেবীভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে নিয়েছেন।
(খ) ভগীরথের জন্মবৃত্তান্ত—যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ ও পদ্মপুরাণ থেকে নেওয়া।
(গ) কাণ্ডার মুনির উপাখ্যান—স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড থেকে নেওয়া।

☆ **সুন্দরাকাণ্ড :**
সেতুবন্ধনের সময় রামের শিব প্রতিষ্ঠার বিবরণ—কুর্মপুরাণ থেকে সংগৃহীত।

☆ **লঙ্কাকাণ্ড :**
(ক) চণ্ডিকার অকালবোধনের কাহিনি কৃত্তিবাস দেবী ভাগবত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও কালিকাপুরাণ থেকে নিয়েছেন।
(খ) গন্ধমাদন পর্বত থেকে বিশল্যকরণী আনার সময়ে হনুমানকে কালনেমির বাধাদানের বৃত্তান্ত অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুসরণে লেখা।

☆ **উত্তরাকাণ্ড :**
লবকুশের হাতে ভরত, শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ পরাজিত ও নিহত হলে তাঁরা যে বাল্মীকি প্রসাদে পুনর্জীবিত হন, এই বৃত্তান্তটির উৎস কৃত্তিবাস নিজেই নির্দেশ করে বলেছেন—

এসব গাহিল গীত জৈমিনি ভারতে।
সম্প্রতি যে গাই তাহা বাল্মীকির মতে।।

সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নলিখিত কাহিনিগুলিতে মানবজীবনের সুখ-দুঃখের রূপ এবং গীতিকাব্যের অন্তর্লীন গভীরতার উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল—অঙ্গদ কর্তৃক সিন্ধুবধ, রামের নির্বাসন ও ভরতমিলন, সীতাহরণে রামের বিলাপ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, সীতা নির্বাসন, লবকুশ কর্তৃক রাম সৈন্যের পরাভব, সীতার পাতাল প্রবেশ, রামের লক্ষ্মণ বর্জন, হনুমানের দাস্য ভক্তি ইত্যাদি।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখলে দেখা যায় যে, কৃত্তিবাস বাল্মীকির অনেক কাহিনি ইচ্ছামত পরিবর্তন করে নিয়েছেন। কোথাও বা অন্যান্য পুরাণ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। যেমন, আদিকাণ্ডে দস্যু রত্নাকর 'মরা মরা' বলে পাপমুক্ত হয়েছিলেন। তা বাল্মীকি রামায়ণে নেই, অধ্যাত্ম রামায়ণের 'অযোধ্যা কাণ্ডে' এক কাহিনি পাওয়া যায়। হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানও কবি কৃত্তিবাস সম্ভবত 'দেবী ভাগবত' ও 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। গঙ্গা আনয়ন প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস যে কাণ্ডারমুনির গল্প সন্নিবিষ্ট করেছেন তা 'স্কন্দপুরাণ'-এর অন্তর্গত 'কাশীখণ্ড' থেকে গৃহীত। হনুমানের বিশল্যকরণী ঔষধ নিয়ে আসার সময় কালনেমির বাধা দেওয়ার কাহিনি অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে। আবার লব-কুশের সঙ্গে রাম ও ভরত, লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের যুদ্ধের বিবরণ 'জৈমিনি ভারত' থেকে সংগৃহীত।

এ সমস্ত উল্লেখ থেকে দেখা যায় যে, কৃত্তিবাস কোনো কোনো কাহিনি সম্পূর্ণ কল্পনাবলে সৃষ্টি করেছিলেন; কিছু আবার পুরাণাদি থেকে সংগ্রহ করেছেন। আবার তার অনেক উক্তি সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা বা শাস্ত্র পুরাণাদি থেকে গৃহীত।

Scanned with CamScanner

শুধু কাহিনি বিন্যাসে নয়, চরিত্রচিত্রণে, যুগজীবনের রূপায়ণে, বাঙালিয়ানা-র পরিচয়ে, ভক্তিবাদের প্রচারে, করুণ রসের উৎসারে এবং স্বতন্ত্র কবি দৃষ্টির পরিচয়ে কৃত্তিবাসের অনুবাদের স্বাতন্ত্র্য অতুলনীয়।

▲ কৃত্তিবাস সমস্যা ঃ

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অপরাপর বহু সমস্যার মতো কবি কৃত্তিবাসের আত্মজীবনী এবং তাঁর জীবনের প্রধান কয়েকটি তথ্য সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ আজও কিছু সংশয় পোষণ করে থাকেন। এই সংশয়গুলিকে কেউ কেউ 'কৃত্তিবাস সমস্যা' বলে উল্লেখ করেছেন।

(ক) কৃত্তিবাসের আত্মজীবনীর প্রামাণিকতা ঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকে বদনগঞ্জ নিবাসী হারাধন দত্তের কাছে রাখা একটি পুঁথি থেকে 'কৃত্তিবাসের আত্মজীবনী' অংশ ছাপিয়ে প্রকাশ করেন, যাকে অনেকে জাল বলে সন্দেহ করেছেন। পরে ঢাকার নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আর একটি পুঁথি থেকে প্রায় এক ধরনের 'কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী' প্রকাশ করেন। এবং পরে এই আত্মকাহিনির টুকরো টুকরো সংবাদ অপরাপর কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথি থেকে পাওয়া যায়। এই সমস্ত আত্মকাহিনি মিলিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনা ও তথ্যের সমন্বয়ে বর্তমানে 'কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী'র সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত ধারণায় আসা গেছে।

(খ) তবে কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যমধ্যে তিনটি বিষয়ে অদ্ভুতভাবে নীরব থেকেছেন। বিষয়গুলি—(i) কোন্ সালে জন্ম। (ii) কাব্য-রচনার তারিখ। (iii) কোন্ গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে তিনি সংবর্ধনা ও কাব্য রচনার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

কবি কৃত্তিবাস তাঁর আত্মপরিচয় অংশে গৌড়েশ্বরের সভা, রাজপ্রাসাদ ও সভাসদ্‌দের যে বর্ণনা ও নাম উল্লেখ করেছেন তাতে কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা 'দনুজমর্দনদেব' গণেশ (কংস)। এই মত অনুযায়ী গৌড়েশ্বরের সভায় যাঁদের নাম করেছেন তারা হিন্দু। অতএব রাজাও হিন্দু। রাজা গণেশের রাজত্বকাল ১৪১৪-১৫—১৪১৮ খ্রিস্টাব্দ। তবে গৌড়েশ্বরের সভায় আরও যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল যাদের নাম উল্লিখিত হয়নি, তারা মুসলমান হতে পারেন। অতএব মুসলমান না হিন্দু—এই প্রশ্নে ঐ গৌড়েশ্বর যে গণেশ এই অনুমান মিথ্যা।

অনেকের মতে ঐ গৌড়েশ্বর হচ্ছেন তাহিরপুরের বড় জমিদার রাজা কংসনারায়ণ। এ মতও যুক্তিসম্মত নয়। কারণ এক সাধারণ জমিদারকে এমন স্বাধীনচেতা কবি রাজা বলে প্রশস্তি করতে পারেন না।

আবার সম্প্রতি অনেকে সিদ্ধান্ত করেছেন কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক রাজা হলেন রুকনুদ্দীন বরবক শাহ (১৪৪৯—১৪৭৪)। এই মতও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও তথ্য থেকে বলা যায় যে, কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বর হচ্ছেন রাজা গণেশের ধর্মান্তরিত পুত্র ও উত্তরাধিকারী জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহ। এই অনুযায়ী কবির জন্ম ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি এবং কাব্য রচনার কাল জালালউদ্দিনের রাজ্যলাভের ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দের দু'চার বছরের মধ্যে। এই মতের যুক্তিগুলি হল ঃ

(এক) খামলুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে

Scanned with CamScanner

২৮। বিক্রমপুর কাঁটাদিয়া নিবাসী শিবচন্দ্র সেন প্রণীত—মহাভারতের সাবিত্রী ও অপরাপর উপাখ্যানের অনুবাদ।

● কাশীরাম দাস (দেব) ঃ

কাশীরাম সম্বন্ধে মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্তুতি প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশী, কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।।

—কাশীরাম সম্বন্ধে এই উক্তি সার্থক। কেননা কাশীরাম দাস তাঁর 'ভারত পাঁচালী'র মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে তাদের হৃদয়ের সামগ্রীর দ্বারা পুণ্যফল বিতরণ করেছেন। সমগ্র বাঙালি জাতির হৃদয়, সামাজিক আদর্শ ও নীতি কর্তব্যকে কৃত্তিবাস ছাড়া আর কোন কবি এমনভাবে ব্যক্ত করতে পারেন নি। সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের যে সমস্ত ভাবানুবাদ হয়েছিল, তার মধ্যে কাশীদাস-ই শ্রেষ্ঠ অনুবাদক।

☆ কবির ব্যক্তি পরিচয় ঃ

কাশীরামের নিজের দেওয়া তথ্য এবং অন্যান্য তথ্যাদি থেকে তাঁর ব্যক্তি পরিচয় জানা যায়। কাশীরাম দাসের জন্ম বর্ধমানের ইন্দ্রানী পরগণার অন্তর্গত সিঙ্গি (সিদ্ধি) গ্রামে, কায়স্থ বংশে। কাশীরামের পিতার নাম কমলাকান্ত। কোন কোন পুঁথিতে তিনি এভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন—

ইন্দ্রানী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী।।
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গি গ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম।।
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।।
পাঁচালি প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণ পদে মনে অভিলাষ।।

☆ কাব্য রচনার উৎস ঃ

কাশীরামের পদবী ছিল 'দেব'। দেবের স্থলে দাস ব্যবহার করেছেন বিনয়বশত। তাছাড়া ধর্মবিশ্বাসে কাশীরাম ছিলেন বৈষ্ণবভাবাপন্ন।

গদাধরের 'জগৎমঙ্গল' থেকে জানা যায়, কাশীরাম মেদিনীপুর জেলার আত্রাসগড়ের রাজার বাড়িতে শিক্ষকতা করতেন। কোন কোন পুঁথিতে পাওয়া যায়, হরিহরপুরের অভিরাম মুখুটীর আশীর্বাদে ও নির্দেশে কাশীরাম 'ভারত পাঁচালী' রচনা করেন।

হরিহরপুর গ্রাম সর্বগুণ ধাম।
পুরুষোত্তম-নন্দন মুখুটী অভিরাম।।
কাশীরাম বিরচিল তাঁর আশীর্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজ পাদপদ্মে।।

কবির আবির্ভাব কাল ও কাব্য রচনাকাল নিয়েও মতভেদ আছে। কবির ছোট ভাই গদাধর দাস 'জগৎমঙ্গল' রচনা করেছিলেন (১৬৪২-৪৩) খ্রিস্টাব্দে। এই কাব্যে কাশীরামের কাব্যের উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং কাশীরামের কাব্য 'জগৎমঙ্গলের' পূর্বে

Scanned with CamScanner

রচিত। সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত কাশীরামের একটি পুঁথিতে পাওয়া যায় কাশীরামের কাব্য ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত। ১৮৬৬ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রকাশিত মূল মহাভারতে আছে—

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর।।

সুতরাং অনুমান করা হয় কাশীরাম সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করেননি। অনুমান করা হয়, কাশীরামের পরিবারের যেহেতু সকলেই অল্পবিস্তর কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাই শেষ পর্বগুলিতে তাঁদের হস্তক্ষেপ পড়তে পারে। তাছাড়া রচনারীতির দিক থেকে প্রথম চারটি পর্বে যে সংহতি তা শেষের পর্বগুলিতে অনুপস্থিত। সমালোচকদের মতে, কবির তিরোধানের পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র দুজনে মিলে কাব্যটি সমাপ্ত করেন।

☆ **কাব্যবৈশিষ্ট্য ঃ**

অনুবাদের ক্ষেত্রে কাশীরাম হুবহু অনুবাদ করেননি। তিনি কৃত্তিবাসের মতো মর্মানুবাদ করেছেন। সাধারণ মানুষের কথা ভেবে, রসতৃষ্ণা চরিতার্থ করবার জন্য তাদের উপযোগী করে কবি তাঁর মহাভারত রচনা করেছেন। কাশীরামের মহাভারত রচনার উদ্দেশ্যও ধর্মমূলক। কাব্যে তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ

যেই বাঞ্ছা করি লোক শুনয়ে ভারত।
গোবিন্দ করেন পূর্ণ তার মনোরথ।।

কাশীরাম পণ্ডিত কবি ছিলেন। কাশীরাম ব্যাসদেবের মূল সংস্কৃত মহাভারতের বেশ কিছু অংশ গ্রহণ-বর্জন করেছেন। সংস্কৃত মহাভারত ছাড়াও নানা পুরাণ ও উপপুরাণ থেকে কাশীরাম তাঁর কাব্যে কাহিনির উপাদান সংগ্রহ করেছেন। যেমন, শ্রীবৎস চিন্তার উপাখ্যান, পারিজাত হরণ, সত্যভামা তুলাব্রত, রাজসূয় যজ্ঞে বিভীষণের আগমন প্রভৃতি ঘটনা ব্যাসদেবের মহাভারতে নেই।

কাশীরাম যে সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন, তার বড় প্রমাণ ব্যাসদেবের মহাভারতের সঙ্গে যথেষ্ট ভাষাগত সাদৃশ্য তাঁর কাব্যের। সংস্কৃত ভালো না জানলে কাশীরাম এভাবে ব্যাসদেবের মহাভারতের স্বচ্ছ অনুবাদ করতে পারতেন না। যেমন,

বৈয়াসকী মহাভারত ঃ অর্থানামর্জনে দুঃখং বর্ধনে রক্ষণে তথা।
তেষাং হি বৈরিনো জ্ঞাতি বহ্নি তস্কর পার্থিবাঃ।।

কাশীরামের মহাভারত ঃ উপার্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে।
ব্যয়ে হয় যত দুঃখ ক্ষয়েতে দ্বিগুণে।।
অর্থ যার থাকে তার সদা ভীত মন।
তার বৈরি রাজা-অগ্নি-চোর-বন্ধুজন।।

কাশীরাম অনুবাদের ক্ষেত্রে যে মূলকেই অনুসরণ করেছেন তা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই স্পষ্ট হবে। যেমন—

বৈয়াসকী মহাভারত ঃ দ্রৌপদীর উৎপত্তি ও বর্ণনা 'কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিত'।

কাশীদাসী মহাভারতের আদি পর্বে এই বর্ণনা হল ঃ

তবে এই যজ্ঞমধ্যে কন্যার উৎপত্তি।
জন্মমাত্র দশদিক করে মহাদ্যুতি।।

Scanned with CamScanner

বৈয়াসকী মহাভারত : সভাপর্বে ইন্দ্রপ্রস্থে দুর্যোধনের প্রমাদ—

স কদাচিৎ সভামধ্যে ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
স্ফটিকং জলমাসাদ্য জলমিত্যভি শঙ্কয়া।

কাশীদাসী মহাভারত : সভাপর্ব—

বিহার মাতুল সহ করে নরবর।
স্ফটিকের বেদী দেখে যেন সরোবর।।
জল আনি নরপতি গুটায় বসন।
পশ্চাৎ জানিয়া বেদী লজ্জিত রাজন্।।

বৈয়াসকী মহাভারতে বনপর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি বকের প্রশ্ন :

কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্যাং কঃ পন্থাঃ কশ্চমোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব।।

কাশীদাসী মহাভারতে : কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য পথ বলি কারে।
কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে।।
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি।।

কোন কোন ক্ষেত্রে কাশীরাম মূলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে বৈচিত্র্যে ভরিয়ে দিয়েছেন। যেমন, সভাপর্বে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের বর্ণনা :

একবস্ত্র পরিহিতা দ্রৌপদী সুন্দরী।
দুঃশাসন টানিতেছে বসনেতে ধরি।।
সংকটে পড়িয়া দেবী সজল নয়নে।
আকুল হইয়া কৃষ্ণে ডাকে নারায়ণে।।

কাশীরাম দাস নতুন বেশ কিছু বিষয়ও যোগ করেছেন। যেমন, বনপর্বে শ্রীক্ষেত্রমাহাত্ম্য, শান্তিপর্বে একাদশী মাহাত্ম্য ও হরিমন্দির মার্জনের ফল প্রভৃতি মূল মহাভারতে নেই। এমনকি কাশীদাসী মহাভারতে হরিভক্তিবাদের যে প্রাধান্য তাও মূল মহাভারতে নেই।

কাশীদাসী মহাভারতে মূল থেকে বিচ্যুতি সবচেয়ে বেশি অশ্বমেধ পর্বে। যেমন মূলের নীল রাজার কাহিনি কাশীদাসে নীলধ্বজ-জনা উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে। মধুসূদন তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যে এই কাহিনি অনুসরণ করেছেন। সভাপর্বের হংসধ্বজ রাজার প্রসঙ্গ সম্পর্কেও একই কথা খাটে।

কাশীরাম অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাবানুবাদের রীতিকে গ্রহণ করেছেন। ব্যাস ভারত ও জৈমিনি ভারতের কাহিনির প্রভাবে কাশীরামের নামে প্রচলিত মহাভারতের কাহিনি পরিপুষ্ট হয়েছে। কাশীরাম কোথাও আক্ষরিক অনুবাদ করেননি, কোন কোন ক্ষেত্রে মৌলিক পদও সন্নিবেশ করেছেন, কিন্তু মূল মহাভারতের কাহিনির রস ক্ষুণ্ণ হয়নি।

কৃত্তিবাস ও কাশীরাম উভয়ে পাঁচালি রীতি অনুসরণ করলেও কাশীদাসের রচনার মধ্যে তার কবিত্বের মৌলিক তৎসম শব্দের মাধ্যমে গ্রন্থন নৈপুণ্য সপ্রশংস উল্লেখের দাবি রাখে। যেমন, দুর্যোধন কন্যা লক্ষ্মণার রূপ বর্ণনা :

অনুপম মুখ তার জিনি শরদিন্দু।
কনকন কুণ্ডল কনক প্রিয়বন্ধু।।

Scanned with CamScanner

সম্পূর্ণ মিহির জিনি অধর রঙ্গিমা।
ভ্রূভঙ্গ অঙ্গন চাপ জিনিয়া ভঙ্গিমা।।

অর্জুনের রূপ বর্ণনা ঃ

অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।।
... ...
ভুজযুগ নিন্দে নাগ আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুলম্বিত।।

একথা ঠিকই যে, কাশীরাম কৃত্তিবাসের মতো অনুবাদের ক্ষেত্রে মৌলিকতা দেখাতে পারেন নি। কেননা কৃত্তিবাসের মধ্যে যে সহজ গ্রামীণ ঘরোয়া রূপ ছিল, তা কাশীরামের মধ্যে ছিল না। তবে একথা ভুললে চলবে না যে, কাশীরাম যখন কাব্যরচনা আরম্ভ করেন তখন সাহিত্যের আদর্শ ছিল চৈতন্য প্রভাবান্বিত উত্তরাপথের আদর্শ। সেজন্য গ্রামীণ বাংলা কাব্যছন্দের পরিবর্তে তৎসম শব্দপ্রাধান্য স্বাভাবিক ভাবেই এসে গিয়েছে কাশীরামের রচনায়। তাই কাশীরামের কাব্যে তৎসম আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট। যেমন—চলৎচপলা, নিষ্কলঙ্ক ইন্দ্রজ্যোতিঃ ইত্যাদি।

কাশীরাম তার কাব্যে কৃত্রিম কাব্যকলার অনুসরণ করেছেন। সেজন্য তিনি তাঁর কাব্যে ঝংকারমুখর শব্দশৃঙ্খলকে অনুসরণ করেছেন। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ বর্ণনায় তিনি তৎসম শব্দবহুল যে ঘনপিনদ্ধ বাক্‌রীতি ব্যবহার করেছেন, তা প্রশংসনীয় ঃ

সহস্র মস্তক শোভে সহস্র নয়ন।
সহস্র মুকুটমণি কিরীট ভূষণ।।
সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল।
সহস্র নয়নে রবি সহস্র মণ্ডল।।

কাশীরামের মহাভারতের চরিত্রগুলি বাঙালির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, জীবনচর্যার ধ্যানধারণায় মিশে গেছে। তাই ভীম ও অর্জুন মূল মহাভারতের মতো ক্ষাত্রতেজে দীপ্ত নয়। দ্রৌপদী তাই অনেকটাই কোমলমতি বাঙালি বধূ সভাপর্বে দ্রৌপদী ও হিড়িম্বার যে কলহ বর্ণিত হয়েছে, তা সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজের দুই সতীনের কলহ স্মরণ করিয়ে দেয়। সভাস্থলে দ্রৌপদীর সঙ্গে ভীমপত্নী হিড়িম্বা আসন গ্রহণ করলে ক্রুদ্ধা দ্রৌপদী সপত্নীসুলভ ঈর্ষা বশে হিড়িম্বাকে কটু ভাষায় গালি দেন ঃ

কৃষ্ণা বলে, নহে দূর খলের প্রকৃতি।
আপনি প্রকাশ হয় যার যেই রীতি।।
কি আহার কি বিচার কোথায় শয়ন।
কোথায় থাকিস তোর না জানি কারণ।।

তার উত্তরে হিড়িম্বা দ্রৌপদীকে শাসিয়ে চলে ঃ

কুপিল হিড়িম্বা দ্রৌপদীর বাক্যজালে।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কৃষ্ণা প্রতি বলে।।
অকারণে পাঞ্চালি করিস অহঙ্কার।
পরে নিন্দা নাহি দেখ ছিদ্র আপনার।।

তারপর হিড়িম্বা পুত্র ঘটোৎকচের বিশেষ প্রশংসা করলে কৃষ্ণা ক্রুদ্ধা হয়ে বলেন, "পুত্রের করহ গর্ব খাও পুত্র মাথা।"

Scanned with CamScanner

দুই সতীনে এরপর শুরু হয় চুলোচুলি। শেষ পর্যন্ত কুন্তী এসে তা সামাল দেন। এই ঘটনা কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডী ও গঙ্গার কলহকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সে যাই হোক্, কাশীরাম এই ঘটনার দ্বারা কৌতুকরস সৃষ্টি যেমন করেছেন, তেমনি তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্রটিকেও উপহার দিতে পেরেছেন।

কাশীদাসের মহাভারত আদ্যন্ত সুন্দর ও জীবন্ত। বর্ণনাগুলি সহজ ও স্বাভাবিক। যেমন আদি পর্বে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নপর সৈন্যদের চিত্র ঃ

যেদিকে পারিল যেতে সে গেল সেদিকে।
পলায় পশ্চিমবাসী রাজা পূর্ব্বদিকে।।
উত্তরের রাজাগণ দক্ষিণেতে গেল।
পথাপথ নাহি জ্ঞান যে দিক পাইল।।

শিল্পরীতিতে কাশীরাম দাসের স্বকীয়তার পরিচয় তাঁর কাব্যে রয়েছে। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ প্রসঙ্গে কাশীরাম অর্জুনের ক্ষাত্রজনোচিত চরিত্রধর্ম ও শারীরিক সৌন্দর্য অপূর্ব মণ্ডনকলায় মণ্ডিত করেছেন ঃ

দেব দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।।
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।।

কাশীদাসী মহাভারতের কোন কোন উক্তি প্রবাদের মতো প্রচলিত হয়ে আসছে। যেমন ঃ

আপন অর্জিত যদি বিষবৃক্ষ হয়।
কাটিতে আপন হস্তে সমুচিত নয়।।

কিংবা,

প্রলয় সমুদ্র কিসে রাখিবেক কুলে।
বালিবান্ধে কি করিবে নদীস্রোত জলে।।

কাশীরামের বৈষ্ণব ভক্তির পরিচয় রয়েছে তাঁর কাব্যে। যেমন,

কারণ-করণ-কর্তা দেব গদাধর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর।।

এমনকি, সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিবাদ সমাজে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার প্রমাণ মেলে কাশীদাসী মহাভারতে।

বাঙালি সুদীর্ঘকাল ধরে পান করে আসছে কাশীদাসী কাব্যামৃতা। কাশীদাসী মহাভারতে এমন একটা বিশুদ্ধতা ও স্নিগ্ধতা আছে, যা ভক্তি মিশ্রিত সহজ ধর্মবোধ সংযোগে আমাদের জাতীয় মনটিকে তৈরি করেছে, জাতীয় মনের সঙ্গে সঙ্গে আবার এ মহাভারতও গড়ে উঠেছে। তাই এই কাব্যকে লোককাব্য বলা চলে। সুতরাং এসব দিক থেকে কাশীরামের মহাভারত মহাভারতের অনুবাদ শাখার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পরাগল, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, গঙ্গাদাস সেন কিংবা সঞ্জয় কেউই কাশীরামের সঙ্গে কবিত্বশক্তিতে তুলনীয় হতে পারেন না।

দীনেশচন্দ্র সেন পরবর্তী কালে কাশীদাসী মহাভারতের প্রভাবের দিক থেকে যথার্থই বলেছেন, "বঙ্গদেশে এই মহাভারতসমুদ্র হইতে এখনও 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্র', 'রৈবতক',

Scanned with CamScanner